ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি উল্টো পথে?

এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার

ড. রুশাদ ফরিদী

আইএফডি এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ সিরিজ
ইন্টারভিউ ৩
অগাস্ট ২৪, ২০১৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়ম হচ্ছে, দুর্নীতি হচ্ছে – এই অভিযোগটি অনেক পুরনো। তবে এতোদিন এই অভিযোগগুলো আসত মূলত শিক্ষার্থী এবং মিডিয়ার পক্ষ থেকে। শিক্ষকদের পক্ষ থেকে এই বিষয়গুলি নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা কখনোই দেখা যায়নি।

অতি সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের এসিসট্যান্ট প্রফেসর **ড. রুশাদ ফরিদী** এই দীর্ঘদিনের অচলায়তনটি ভেঙ্গেছেন। বিগত ৭ জুলাই, ২০১৭ তারিখে তার লেখা **"উল্টো পথে কি শুধুই বাস?"** শিরোনামে একটি আর্টিকেল প্রকাশিত হয় প্রথম আলো'তে। তিনি এই আর্টিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুশাসন নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। এই আর্টিকেলটি প্রকাশ হওয়ার পরই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাকে শাস্তিস্বরূপ বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

এখানে উল্লেখ্য, বিগত বছরগুলিতে আমরা বিভিন্ন সময়ে চেষ্টা করেছি একাধিক শিক্ষককে এই বিষয়ে কথা বলতে রাজি করানোর ব্যাপারে। দুইজন শিক্ষক রাজিও হন। এদের একজন বর্তমান শিক্ষক, এবং অপরজন সাবেক।

দুইজনকেই আমরা প্রশ্নমালা পাঠাই সাক্ষাৎকারের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য। তবে তার পরবর্তিতে আমরা তাদের কাছ থেকে আর কোন সাড়া পাইনি। হতে পারে প্রশ্নগুলো তাদের কাছে খুবই সংবেদনশীল মনে হয়েছে। তাই তারা এই ব্যাপারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেননি। আমরাও তাদেরকে এই বিষয়ে আর জোর করিনি।

কিন্তু ড. রুশাদ ফরিদী এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তিনি আমাদের আহবানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছেন, উওর দিয়েছেন আমাদের সকল প্রশ্নের।

যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ভালবাসেন, যারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি দেখতে চান, তারা আমাদের এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানাবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। এই সাক্ষাৎকারে ড. রুশাদ স্পষ্ট ভাষায় কিছু সাবধানবানী উচ্চারণ করেছেন, যার প্রতি আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে সবকিছুর জন্য তিনি শুধু অন্যদেরকে দায়ী করেননি, করেছেন আত্মসমালোচনাও। সবাই নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, আত্মসমালোচনা উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

আমরা মনে করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য শুধুমাএ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং শিক্ষকদের প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয়। এই প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত হতে হবে বর্তমান এবং সাবেক শিক্ষার্থীদেরকেও।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের অনেকেই অনেক ক্ষমতাধর পদে রয়েছেন। অনেকে রয়েছেন মিডিয়াতে। তাদের সবার কাছে আমাদের আবেদন আপনারা যার যার অবস্থানে থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে ভূমিকা পালন করুন, যাতে এই বিশ্ববিদ্যালয় আগামীতে বিশ্বে একটি মর্যাদাকর আসনে উন্নীত হতে পারে।

মাবরুর মাহমুদ
প্রতিষ্ঠাতা, আইএফডি

© IDEAS FOR DEVELOPMENT (IFD)
www.ideasfd.org
ideasfd@gmail.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি উল্টো পথে?

বিগত ৭ জুলাই, ২০১৭ তারিখে আপনার লেখা একটি আর্টিকেল প্রকাশিত হয় প্রথম আলো'তে "উল্টো পথে কি শুধুই বাস?" শিরোনামে। সেখানে একটি বিষয় আমাদের খুব ভাল লেগেছে। আপনি বলেছেন, "....একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যেখানে মূল অবদান রাখার কথা জ্ঞান সৃষ্টি, জ্ঞান বিতরণ এবং সামগ্রিকভাবে জ্ঞানচর্চা, সেই জায়গায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় আছে?" আপনি এই প্রশ্নের একটি উওর দিয়েছেন আর্টিকেলটির পরবর্তি অংশে। কিন্তু আমরা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি আপনার নিশ্চয়ই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পর্ক অনেকদিনের। এই সম্পর্কের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আপনি এই জ্ঞান চর্চা এবং জ্ঞান বিতরণের জায়গাটাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন কিনা?

পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি অবশ্যই, তবে দুঃখজনক হলেও সত্যি সেটা নিম্নগামী পরিবর্তন। ইতিবাচক কোন পরিবর্তন আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমার মনে হচ্ছে যে দিন দিন অবস্থা আরো খারাপ হচ্ছে। আপনি নিজেও হয়তো জানেন যে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাটা সরাসরি বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে যুক্ত। এই রাজনৈতিক পরিমন্ডলে যে ধরণের অবস্থা থাকে, তার সরাসরি প্রভাব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে পড়ে।

সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু নিয়ন্ত্রণ করে সরকার, যদিও এটি একটি স্বায়ওশাসিত প্রতিষ্ঠান, কিন্তু এটি যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় দেশের রাজনৈতিক নের্তৃত্বের মাধ্যমে এবং তাদের কোন প্রকার অগ্রাধিকার নেই জ্ঞানচর্চা বা জ্ঞান বিতরণের। কারণ হল, যেটা আমি আমার আর্টিকেলেও বলেছি, তারা মনে করেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। তাই এখানে রাজনৈতিক বিষয়টা নিয়ন্ত্রণ করাটা তাদের মূল দায়িত্ব। সেই কারণে জ্ঞানচর্চা হল কি হল না, সেই ব্যাপারে তাদের বিন্দুমাত্র কিছু আসে যায় না। এবং মূলত এই কারণেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি দিন দিন আরো বেশি খারাপ হচ্ছে।

একজন শিক্ষার্থী হিসাবে এবং একজন শিক্ষক হিসাবে আপনার সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক কবে থেকে?

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি হই ১৯৯২ সালে। যদিও সেই সময় সেশন জ্যামের কারণে আমাদের ক্লাস শুরু হতে এক বছর দেরি হয়। আমাদের সেশন আসলে ১৯৯১-১৯৯২। তারপর আমি ১৯৯৬ সালে অনার্স পাশ করি এবং মাস্টার্স পাশ করি ১৯৯৭ সালে।

তারপর ১৯৯৯ সালে আমি বিদেশে চলে যাই পিএইচডি করার জন্য। তারপর দেশে ফিরে আসি ২০০৬ এ। তখন আমি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেই ফুলটাইম ফ্যাকাল্টি হিসাবে। তারপর ২০০৮ সালের জানুয়ারীতে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেই শিক্ষক হিসাবে এবং এখনো এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আছি প্রায় নয় বছর ধরে।

সাধারণত আমরা দেখে থাকি যে অনার্স-মাস্টার্সের পর যারা ডিপার্টমেন্টে ফার্স্ট-সেকেন্ড হয়, তারা একটি সুযোগ পান লেকচারার হিসাবে যোগ দেয়ার জন্য। কিন্তু আপনি তখন শিক্ষক হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন যোগ দেননি?

আসলে বিষয়টা এমন না যে অবধারিতভাবে প্রতিটি ব্যাচ থেকেই শিক্ষক নেয়া হবে। এটা নির্ভর করে কোন পদ খালি আছে কিনা, তার উপরে। এছাড়াও আরো অনেক অন্য রকম হিসাব-নিকাশ আছে। সেই জন্য প্রতি বছরই যে শিক্ষক নেয়া হবে, তার কোন গ্যারান্টি নেই। যেমন আমাদের ব্যাচের দুবারই যে ফার্স্ট হয়েছে, সেও কিন্তু জয়েন করতে পারেনি। কারণ মাঝের দুই-তিন বছর কোন শিক্ষক নেয়া হয়নি। এই সময় তো আর কেউ বসে থাকবে না, যে যার মত উচ্চশিক্ষার জন্য বাইরে চলে যায়।

আপনি উচ্চশিক্ষার জন্য কোথায় গিয়েছিলেন?

আমি আমেরিকার ভার্জিনিয়া টেক ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি করেছি।

আমরা তো জানি ভার্জিনিয়া টেক বেশ নামকরা একটি ইউনিভার্সিটি। এই সম্পর্কে আপনি আমাদের পাঠকদেরকে কিছু বলবেন?

ভার্জিনিয়া টেক আসলে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য খুব ভাল একটি ইউনিভার্সিটি। আমি যখন সেখানে ছিলাম, তখন তা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য প্রথম দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছিল। তবে অর্থনীতিতে ভার্জিনিয়া টেকের অবস্থান খুব উপরে ছিল না। তারপরও এটি প্রথম ৪০-৫০ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ছিল। তবে এক সময় তারা অর্থনীতিতে প্রথম দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ছিল।

আপনি তো পিএইচডি করার পর আমেরিকাতে থেকে যেতে পারতেন। আপনি দেশে চলে আসলেন কেন?

তখন দেশে চলে আসার পিছনে অনেকগুলো কারণ ছিল। প্রথম হল যারা প্রথম বিদেশে যায়, তারা শুরুতে ভাবে যে বিদেশে আমি বেশিদিন থাকবো না। প্রথম পাঁচ-ছয় মাস তাদের এই অনুভূতিটি থাকে। তারপর ধীরে ধীরে তাদের মানসিকতা পরিবর্তন হতে থাকে। একসময় আসে যখন তারা সেখানেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

কিন্তু আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, যতোই দিন যাক আমার মানসিকতার কোন পরিবর্তন হয়নি। আমার সব সময়ই মনে হতো যে আমি দেশেই ফিরব। আমার মনে হতো যে, বিদেশের মাটিতে আমি যতোই ভাল করি না কেন, ভাল থাকি না কেন, আমার মনে হতো যে আমি সেই দেশের কেউ নই। ওখানকার সবকিছুই আলাদা। আমার সব সময় মনে হতো যে এখানে আমার কিছু নেই। এটা আমার না। এই ধরণের একটি অনুভূতি আমার সব সময় হত। এই অনুভূতিটাই ছিল সবচেয়ে বড় মোটিভেটিং ফ্যাক্টর আমার দেশে ফিরে আসার পিছনে।

বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশেষ করে আপনার বিভাগে যে শিক্ষকরা প্রতিনিয়ত প্রমোশন পাচ্ছেন, লেকচারার থেকে এসিসট্যান্ট প্রফেসর হচ্ছেন, তারপর এসোসিয়েট প্রফেসর, তারপর প্রফেসর - এই পদোন্নতিগুলোর পিছনে মূল মানদন্ড হিসাবে কি কাজ করে?

সত্যি কথা বলতে কি একটি অফিশিয়াল মানদন্ড তো আছে। অফিশিয়ালী লেখা আছে যে এই এই বিষয়গুলো পূরণ করতে হবে। যেমন পাবলিকেশনের ক্ষেত্রে বলা আছে যে, লেকচারার থেকে এসিসট্যান্ট প্রফেসর হতে হলে এতোগুলো পাবলিকেশন থাকতে হবে, এসোসিয়েট প্রফেসর হতে হলে এতোগুলো পাবলিকেশন থাকতে হবে। কিন্তু অফিশিয়াল মানদন্ডগুলো যা আছে, সেগুলির সবই খুবই হালকা মানদন্ড, খুব লুজ।

যেমন আমাদেরকে বলা হয়েছে কোন জার্নালে লেখা ছাপালে আমরা পাব ১ পয়েন্ট। কিন্তু এটা কি ধরনের জার্নাল তার কোন উল্লেখ নেই। যেমন ধরা যাক যদি আমেরিকান ইকোনমিক রিভিউতে আমি পেপার পাবলিশ করি, যেটা কিনা অর্থনীতিতে বিশ্বের সেরা জার্নাল, যেখানে কিনা আমরা সারা জীবন চেষ্টা করলেও লেখা ছাপাতে পারব না; আমাদের জন্য ব্যাপারটা অনেকটা অসম্ভব ব্যাপার সেখানে

লেখা ছাপানো; আমার জানা নেই বাংলাদেশ থেকে কেউ সেখানে লেখা ছাপিয়েছেন কিনা। এই জার্নালে পাবলিশ করলে আমি পাব ১ পয়েন্ট।

আবার আমাদের এখানে কথার কথা ধরা যাক, ঢাকা সোশ্যাল সাইন্স রিভিউ, যেখানে কিনা আমি দুই-তিন দিন কাজ করলেই একটি পেপার পাবলিশ করে ফেলতে পারব, ওখানে পাবলিশ করলেও আমি পাব ১ পয়েন্ট। তাই এই প্রচলিত ব্যবস্থাতে তো কারো কাছে কোন প্রণোদনা নেই যে সে কষ্ট করে কোন নামকরা জার্নালে পাবলিশ করবে, এবং যদি করে, তাহলেও সে পাবে ঐ ১ পয়েন্ট। তাই বাংলাদেশে তো এই রকম কোন প্রণোদনা নেই।

বাইরের দেশগুলিতে এই প্রণোদনা থাকে। ব্যাপারটা এই রকম যে **Publish or Perish**। তার মানে হল আপনি যদি পাবলিশ না করেন, তাহলে আপনার চাকরি চলে যাবে। সোজা কথা আপনি আর চাকরি করতে পারবেন না। বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার শতকরা ৯০ ভাগ হয় চাকরি বাঁচানোর জন্য। এটাই সেখানকার শিক্ষকদের গবেষণা করার পিছনে মূল চালিকাশক্তি। কিন্তু আমাদের এখানে তো ব্যাপারটা একেবারেই নেই। এটা গেল অফিশিয়াল মানদন্ডের ব্যাপার।

কিন্তু এই অফিশিয়াল মানদন্ডটাই সব সময় মানা হয় কিনা, সেটা একটা বড় প্রশ্ন। আমি বলেছি এই মানদন্ডটি খুবই হালকা বা লুজ। দুঃখের বিষয় হল এই হালকা মানদন্ডটাও সব সময় মানা হয় না। দেখা যাচ্ছে যে, আমি আমার বিভাগের নাম বলব না বা অন্য কোন বিভাগের নাম বলব না, সামগ্রিক চিত্রটা হচ্ছে যে অন্যান্য বিভাগগুলোও একইভাবে চলছে। অন্যান্য আরো অনেক বিভাগ রয়েছে যাদের অবস্থা আরো খারাপ। এখানে কোন মানদন্ড মানা হচ্ছে না। এখানে কে, কিভাবে প্রফেসর হচ্ছে না হচ্ছে, তা কেউই জানে না। হঠাৎ করেই আপনি একদিন শুনবেন অমুক প্রফেসর হয়ে গেছেন যার কিনা তেমন কোন প্রকার পাবলিকেশন আছে কিনা, তিনি কোন গবেষণার ধারে কাছে গিয়েছেন কিনা সেটা কেউ জানে না। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়গুলো কিভাবে কি হয়, তা আসলে কেউ জানে না।

তাহলে কি আমরা বলতে পারি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষকের পদোন্নতির ব্যাপারে Quantitative মানদন্ড খুবই হালকা এবং Qualitative বিষয়গুলো মূল ভূমিকা পালন করে, এবং যেহেতু এই ধরনের Qualitative মানদন্ড ব্যবহার করা হয়, সেহেতু পদোন্নতিগুলোর পিছনে মূল ভূমিকা পালন করে শিক্ষকের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা, কে কাকে চেনেন, কে কাকে ভাল জানেন, ইত্যাদি বিষয়গুলো?

হ্যা। অনেকটা তাই।

আপনি যেহেতু একজন শিক্ষক সেহেতু আপনি নিশ্চয়ই জানেন আপনি যদি একটি ভাল গবেষণা করেন, একটি ভাল জার্নালে পাবলিশ করেন, আপনি বিভিন্ন কনফারেন্সে যেতে পারবেন; আপনি যদি আপনার গবেষণা ভালভাবে মার্কেটিং করেন, তাহলে তা আরো অন্যান্য জায়গায় পাবলিশ হবে। এতে আপনার নিজস্ব একটি পরিচয় তৈরি হবে। তো এই ধরনের ধ্যান-ধারণা কি শিক্ষকদের মধ্যে নেই?

হ্যা। আপনি একটি ভাল কথা বলেছেন। তো এটা কেন নেই? বাংলাদেশের বাস্তবতায় বিষয়টা হল যে, আমি আগেও যেটা বলেছি, গবেষণা বা পাবলিকেশনের পেছনে মূল চালিকাশক্তিটি কি? বিদেশে এই চালিকাশক্তি হল Publish or Perish | আর বাংলাদেশে No Perish । আপনি শিক্ষক হিসাবে ঢোকার সাথে সাথে আপনি নিজে Perish না হওয়া পর্যন্ত আপনার চাকরি যাবে না। এর মধ্যে কেউ কেউ যে গবেষণা করছে না, তা কিন্তু নয়। তবে সবাই নয়।

এখানে যে কোন কাজ, এমনকি মুদির দোকানের দোকানদারের কাজও ভাল করতে গেলে তার দুটি জিনিস লাগবে। একটি হল **Reward for Good Work** এবং অপরটি হল **Punishment for Bad Work |** একটি **Incentive Driven System** যা এখানে পুরোপুরি অনুপস্থিত। তাই আপনি যে কথাটি বললেন, কেউ কেউ তো নিজে নিজেই অনেক কিছু করে ফেলতে পারে। হ্যা। কেউ কেউ কিন্তু করছে; করছে না যে তা কিন্তু নয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সুস্থ একাডেমিক পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য সিস্টেমের মধ্যে একটি শক্তিশালী প্রণোদনা থাকতে হয়। তা না হলে কিন্তু সুস্থ একাডেমিক সংস্কৃতি নিজে নিজে গড়ে ওঠে না।

আমি আরো একটি বিষয় বলতে চাই, যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ভাতা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে, কিন্তু তারপরও জীবনযাত্রার ব্যয় এখন যেভাবে বেড়ে গিয়েছে, তখন অনেকের কাছে কিন্তু মনে হয় যে আমার তো চাকরি নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই, তাহলে আমি আরো একটু ভাল থাকার জন্য আমি আমার আয় বাড়ানোর চেষ্টা করিনা কেন?

তাই অনেকে হয়তো কনসালটেন্সি করছে, যেটা কিনা অনেকে গবেষণা বলে চালিয়ে দেয়। কিন্তু কনসালটেন্সি কোন গবেষণা নয়। এই ধরনের কনসালটেন্সিতে তিন-চার মাসের একটি প্রজেক্ট করে বেশ ভাল টাকা পাওয়া যায়। অনেকে আবার প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছে। যার ফলে আসলে প্রকৃত গবেষণা করার পিছনে যে একটি শক্তিশালী বাধ্যবাধকতা থাকা দরকার, তা না থাকার কারণে শিক্ষকরা নিজ থেকেই গবেষণায় উৎসাহী হন না।

আপনি যেহেতু বেতন-ভাতার বিষয়টা আনলেন, তাই আমার প্রশ্ন একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে আপনারা বেতনের বাইরে কি কি ধরনের সুবিধা পান? যেমন প্রতিটি শিক্ষকের জন্য এমন কি কোন নিশ্চয়তা আছে যে তিনি একটি বাড়ি পাবেন, একটি গাড়ি পাবেন, ইত্যাদি?

না। এই ধরনের কোন নিশ্চয়তা নেই। কোন শিক্ষক বাসা পাবেন, কে পাবেন না, তা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় ঐ প্রমোশনের মতোই। রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত কানেকশন কার কতটুকু,

সেটাই মূল বিবেচ্য বিষয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিরপেক্ষভাবে পাওয়া যেতে পারে, তবে তার সংখ্যা অনেক কম। এছাড়া তো আর অন্য কোন সুবিধা নেই। যেমন আমি নিজেও তো কোন বাড়ি পাইনি। আমি আমার নিজের বাসাতেই থাকি।

তাহলে এই অতিরিক্ত সুবিধাগুলো পাওয়ার জন্য যেহেতু ব্যক্তিগত কানেকশন দরকার, তাহলে এটা কি শিক্ষকদের রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন দল করার একটি বড় কারণ?

হ্যা। অনেকটা অপ্রিয় হলেও বিষয়টা সত্য। বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা, প্রমোশন ইত্যাদি নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষকদের একটি বিরাট অংশ রাজনীতির সাথে যুক্ত হন, আমার কাছে ব্যাপারটা সেরকমই মনে হয়।

এখন আমরা যদি গবেষণাকে উন্নত করতে চাই, তাহলে এর অর্থায়ন বা ফান্ডিং একটি বড় ইস্যু। আপনি যদি কোন গবেষণায় হাত দেন, আপনার জন্য কি সেই রকম ফান্ডিংয়ের দরজা খোলা? সরকারের কি এমন কোন ব্যবস্থা আছে কিনা, যেখানে আপনি আবেদন করলেই ফান্ডিং পাবেন?

না। দুঃখজনকভাবে সেই রকম কোন সুযোগ নেই। এটা একটা বড় কারণ গবেষণা না করার ব্যাপারে যা কিনা সবাই বলে। আমেরিকাতে দেখেছি যে ন্যাশনাল সাইন্স ফাউন্ডেশন আছে যেখানে কেউ ভাল প্রপোজাল নিয়ে আসলে সেখান থেকে অনুদান পাওয়া যায়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও একই রকম ব্যবস্থা আছে। আমাদের পাশের দেশ ইন্ডিয়াতেও আছে।

আমাদের দেশে শিক্ষকদের মধ্যে গবেষণা নিয়ে যখন আলোচনা হয়, তখন তাদের আলোচনা শুনে মনে হবে যে এটাই একমাএ কারণ, এবং বাইরের কারো কাছে এটাই যৌক্তিক কারণ বলে মনে হবে। কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হয়, এখন সরকার যদি কালকে সকালে ঘোষণা করল যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার জন্য ১০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হল। আমার ধারণা এমন যদি ঘটে, তাহলে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার মান আহামরি কিছু বাড়িয়ে দেবে না।

এর কারণ হল, সবকিছুর মূলে একটি জবাবদিহিতামূলক সিস্টেম থাকতে হবে যা কিনা আপনার কাজের মূল্যায়ন করবে। বর্তমানে আমাদের কাজের মূল্যায়নের কোন সিস্টেম নেই। আমরা যে শিক্ষকতা করি, গবেষণা তো অনেক পরের কথা, সেটারই কিন্তু মূল্যায়ন আমরা করছি না। আমরা কি পড়াচ্ছি, না পড়াচ্ছি, ক্লাস ইভালুয়্যাশনের কোন ব্যবস্থা নেই। আমরা নিশ্চিত করতে পারছি না যে একজন শিক্ষক তার ক্লাসে ঠিকমতো যায় কিনা। ক্লাসে গেলে সে ঠিকমতো পড়াচ্ছে কিনা সিলেবাস অনুযায়ী কিংবা সেই সিলেবাস সঠিকভাবে আপগ্রেড হচ্ছে কিনা, সেটাও জানা যাচ্ছে না।

প্রায় ডিপার্টমেন্টে দেখা যায় যে একজন শিক্ষক একটি কোর্স ৩০ বছর ধরে পড়াচ্ছেন। এটা কিভাবে সম্ভব? এই শিক্ষক পড়াচ্ছেন, কারণ তিনি কোনভাবেই কোর্স ছাড়তে রাজি নন। কোর্সটা পড়াতে

পড়াতে তিনি এতোটা মজা পেয়ে গেছেন যে তিনি এটা পড়িয়েই যাচ্ছেন। এই কোর্স পড়াতে কোন পূর্ব প্রস্তুতি লাগে না। তিনি চট করে ক্লাসে চলে যান। কিছু একটা পড়িয়ে চট করে চলে আসেন।

তাই আমাদের আসল কাজ যে শিক্ষকতা, সেখানে যেহেতু কোন মানদন্ড ঠিক করে তার মান নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা নেই, সেখানে আমরা গবেষণার মান কিভাবে ঠিক রাখতে পারব? দশ কোটি টাকা যদি আগামী কালকে গবেষণার জন্য দেয়া হয়, সেই টাকা গবেষণাতে ব্যয় হবে, নাকি অন্য কোথাও ব্যয় হবে, তার কোন নিশ্চয়তা আছে? এই টাকা দিয়ে যদি গবেষণা করা হয়, তাহলে তার মান কি হবে, সেই পেপারগুলো কোথায় পাবলিশ হবে, এগুলো কে দেখবে? তাই আমার কাছে মনে হয় যে, অর্থায়ন বা ফান্ডিং কোন বড় বিষয় নয়। তারচেয়েও অনেক বড় ইস্যু হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জবাবদিহি মূলক একটি ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। তা না হলে কোন কিছুরই কোন উন্নয়ন হবে না।

আচ্ছা, আপনি জবাবদিহিমূলক একটি ব্যবস্থার কথা বললেন। আমার এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাএ ছিলাম ১৯৯৪-২০০০ সময়কালে, আমাদেরকে তখন অনেক কোর্সের জন্য দিনের পর দিন ক্লাসের সামনে বসে থাকতে হতো। শিক্ষকরা আসতেন না। যেমন আমরা মাইক্রো এবং ম্যাক্রো অর্থনীতির কোর্সে ক্লাস পেয়েছিলাম দুই সেমিস্টারে মাএ ৮-১০ টা করে - এটা ছিল তখনকার পরিস্থিতি। এই পরিস্থিটি এখন কতোটা পরিবর্তিত হয়েছে? এখনো কি এমন হয় যে শিক্ষকরা ক্লাসে আসেন না, দিনের পর দিন অনুপস্থিত থাকেন?

আসলে এই পরিস্থিতিটা কতোটা খারাপ, নাকি ভাল, তা বোঝাটাও অনেক কঠিন। এর কারণ হল আমরা এই বিষয়গুলোর কোন হিসাব নিচ্ছি না। যেমন একজন শিক্ষক ক্লাসে যাচ্ছেন, নাকি অনুপস্থিত থাকছেন, সেই ব্যাপারে কোন রেকর্ড নেয়া হয় না।

এই রকম কোন রিপোর্টিংয়ের বিষয় নেই যে ক্লাস করে এসে একজন শিক্ষক অমুক একটি রেকর্ডে লিখবেন যে ক্লাস করে এসেছি কিংবা আজকে অনুপস্থিত ছিলাম?

না। এই ধরনের কোন সিস্টেম নেই। একটা যেটা আছে সেটা হল ক্লাস এটেনডেন্স নেয়া হয়। তবে একজন শিক্ষক ক্লাস নিচ্ছেন, নাকি নিচ্ছেন না, সেই ব্যাপারে কোন ইউনিফর্ম সিস্টেম নেই। একেক ডিপার্টমেন্ট একেকভাবে এটা চালাচ্ছে। এখন কোন শিক্ষক যদি ধরেন ক্লাস নিল না, সেটা হয়তো তার এটেনডেন্স শিট দিয়ে বোঝা যাবে। এটা হল স্টুডেন্টদের এটেনডেন্স শিট। শিক্ষকদের কোন এটেনডেন্স সিস্টেম নেই। এটা নির্ভর করছে ডিপার্টমেন্টগুলোর উপর তারা এই বিষয়টা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান যদি কোন ব্যবস্থা করেন যার মাধ্যমে শিক্ষকদের এই জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে, তাহলে সেটা হতে পারে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন থেকে শিক্ষকদের জবাবদিহিতার কোন ব্যবস্থা নেই।

এখন প্রশ্নটি ছিল এই পরিস্থিটি আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে, নাকি ভাল হয়েছে – এটা আসলে আমি বলতে পারব না। কিন্তু আমি এখন অনেক ভয়াবহ উদাহরণ শুনি অনেক ডিপার্টমেন্টে কি ঘটছে। তাই আমার কাছে মনে হয় না এই পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি হয়েছে।

স্টুডেন্টদের পক্ষ থেকে কি শিক্ষকদের কোন ইভাল্যুয়েশনের ব্যবস্থা নেই, যেমন প্রতি কোর্সের পর স্টুডেন্টরা শিক্ষকদের পড়ানো সম্পর্কে মতামত দিতে পারবে?

না। সেই রকম কোন ব্যবস্থা নেই। এটা কোন ডিপার্টমেন্ট হয়তো নিজ থেকেই কোন ব্যবস্থা করতে পারে, তবে আমি এখন পর্যন্ত শুনিনি যেখানে সিস্টেমেটিকভাবে এই ধরনের কোন মতামত নেয়া হচ্ছে। কোন শিক্ষক হয়তো নিজের আগ্রহে নিজ থেকেই নিতে পারেন, তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে এই ধরনের কোন সিস্টেম নেই।

আমরা এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। বিগত বছরগুলিতে আমরা দেখতে পেয়েছি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে। বিষয়টা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাতে শিক্ষাথীরা পাশ করতে পারছে না। আমরা বিভিন্ন মিডিয়ার সংবাদ পর্যালোচনা করে দেখেছি বিগত তিন বছরে একমাএ খ ইউনিট ছাড়া অন্যান্য সকল ইউনিটে পাশের হার লক্ষণীয়ভাবে কমেছে। যেমন ২০১৪ সালে ক ইউনিটে পাশের হার ছিল ২১%, ২০১৬ সালে এসে তা পর্যায়ক্রমে কমে এসে দাঁড়িয়েছে ১৩% এ। গ এবং ঘ ইউনিটেও একই রকমের ক্রমাবনতির ধারা এবং এটা পরিমাণে অনেক বেশি।

যখনই কাউকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়, তখনই ঢালাওভাবে একটি উওর আসে সারা দেশের শিক্ষার মান কমে যাচ্ছে। কিন্তু এটার জন্য কি শুধুমাএ শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রমাবনতি দায়ী, নাকি ব্যাপারটি এমন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাল শিক্ষাথীদের কাছে তার আবেদন দিন দিন হারাচ্ছে? এই সম্পর্কে কোন গবেষণা হয়েছে কিনা, এবং এই বিষয়ে আপনার ব্যক্তিগত অভিমত কি?

সত্যি কথা বলতে কি আমি আসলে এই বিষয়ে খুব বেশি কিছু যে আপনাকে বলতে পারব, তা নয়। কিন্তু আপনি তো বললেন যে ভর্তি পরীক্ষাতে পাশের হারটা যে কমে যাওয়া, এটা যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদন কমে গেছে, এটা বলা যায় কিনা, তা জানি না। তবে আপনি যে দৃষ্টিকোণ থেকে এটা বলেছেন সেটা মনে হয় এটা যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগের মত ভাল ছাএ–ছাত্রীরা আর আসছে না।

এটা আমি বলছি এই কারণে যে, এখন একজন ভাল স্টুডেন্টের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন আর একমাএ অবলম্বন নয়। সাধারণ শিক্ষা নেয়ার জন্য কিন্তু এখন স্টুডেন্টেদের সামনে অনেক পথ খোলা আছে। এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একজন ভাল শিক্ষাথী পুরো স্কলারশিপ পাচ্ছে। বিগত বছরগুলোতে জনসাধারণের আয়ও অনেক বেড়েছে। তাই এতোটা কষ্ট করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার চেয়ে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুল স্কলারশিপ নিয়ে ভর্তি হওয়াটা অনেকের কাছে লোভনীয় মনে

হতে পারে। একজন শিক্ষক হিসাবে আপনারা কি অতীতের বছরগুলিতে শিক্ষার্থীদের মানের কোন অবনতি লক্ষ্য করছেন?

হ্যা। বিগত বছরগুলিতে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে, তাদের মান লক্ষ্যণীয়ভাবে কমে গেছে। আমার মতে এটি খুব সম্ভবত দুটি কারণে ঘটছে। প্রথমত, স্টুডেন্টরা যে ১২ বছরের ট্রেনিং নিয়ে আসছে, সেই ট্রেনিংয়ের মান লক্ষ্যণীয়ভাবে কমে গেছে। দ্বিতীয়ত, এর মধ্য থেকে আবার যারা ভাল আছে, তারা হয়তো আগের চেয়ে অনেক বেশি কম আসছে। এটাও হতে পারে।

আপনাকে এই বিষয়ে একটি ঘটনা বলি। আমার পরিচিত একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হয়েছিল এবং সেই ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান যে ক্লাসটা নিতেন, সেই ক্লাসে পুরো একটা সেমিস্টারে তিনি অর্ধেকেরও কম ক্লাস নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তারচেয়েও ভয়াবহ ব্যাপার হল, তিনি মিড টার্ম পরীক্ষার খাতা হারিয়ে ফেলার কারণে পরের সেমিস্টার শেষ হওয়ার পরও তিনি তার কোর্সের রেজাল্ট দিতে পারেননি। যার ফলে কয়েকজন স্টুডেন্ট হতাশ হয়ে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে বাধ্য হয়।

এই ধরনের ঘটনা যখন ঘটে, তখন কিন্তু তার একটি প্রভাব পড়ে বিভিন্ন পর্যায়ে। তখন তার আত্মীয়-স্বজন শোনে, আত্মীয়-স্বজনের সন্তানরা জানতে পারে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। তাই হয়তো দেখা যায় তারা আগ থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় যে, না আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার কোন চেষ্টাই করব না। এবং এই ধরনের ঘটনাগুলো দিন দিন যতো বাড়ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি তত বেশি হচ্ছে।

এখন এটা কি আপনার ব্যক্তিগত অভিমত, নাকি অন্যান্য শিক্ষকরাও এই বিষয়ে আলোচনা করেন যে শিক্ষার্থীদের মানের দিন দিন অবনতি ঘটছে? শিক্ষকরা কি এই বিষয়ে মোটামুটি একমত?

হ্যা। অধিকাংশ শিক্ষকদের মত এটাই। আমরা হয়তো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একে অপরের সাথে দ্বিমত পোষণ করি। কিন্তু এই বিষয়টা যখন আলোচনায় আসে, তখন দেখা যায় যে সবাই মোটামুটি এই বিষয়ে একমত হন।

আমাদের সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সেরা ডিপার্টমেন্ট। সেসময় যারা ফার্স্ট ক্লাস পেত, তারা বিশ্বের বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি বা মাস্টার্স করার জন্য যেত। এই ধারাটি এখনো আছে, নাকি এটা কমে গেছে?

না। এখনো কম বেশি আছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু আগের চেয়ে বেশি যাচ্ছে।

এই ব্যাপারে কোন উদাহরণ কি দেয়া যায়? যেমন তারা কি ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে?

আসলে এই বিষয়ে আমার কাছে কোন তথ্য-উপাও নেই। তবে আমি যা দেখি যেমন অমুক ব্যাচের এই কয়জন বাইরে গেল, কোথায় গেল, ইত্যাদি। এখন যে কারণে বেশি যাচ্ছে, সেটা হল এখন তথ্যের ব্যবহার অনেক বেশি। এখন অনেক মিডিয়া আছে। অনেকের সাথে সিনিয়রদের যোগাযোগ আছে। বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারছে। তাই তথ্যের সহজলভ্যতা আগের চেয়ে অনেক বেশি হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাইরে যাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। আমার মনে হয় না শিক্ষার্থীদের মান বাড়ার কারণে এটা ঘটছে।

আপনার সময়কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আইভি লীগ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যাওয়ার কোন উদাহরণ কি আছে?

হ্যা। আইভি লীগ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যাওয়ার ঘটনা তো আছে। বেশ কয়েকটা উদাহরণ আছে। এছাড়া অন্যান্য ভাল ইউনিভার্সিটিতে অনেকে গিয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং নিয়ে আপনি আপনার আর্টিকেলে বেশ কিছু মন্তব্য করেছেন। এই র‍্যাংকিং উন্নত করার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন থেকে ডিপার্টমেন্টগুলোকে কি কোন দিক নির্দেশনা দেয়া হয়?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে যারা আছেন, তাদের র‍্যাংকিং নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। বরং অনেকে বলেন যে এই ধরনের র‍্যাংকিংয়ে অনেক ভুল থাকে। ঠিকমতো এগুলো হিসাব করা হয় না। র‍্যাংকিং ভাল হলে তাদেরই ভাল লাগত, কিন্তু এই র‍্যাংকিং বাড়ানোর জন্য যা যা করা দরকার, সেগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের কাছে মোটেই অগ্রাধিকার কোন বিষয় নয়।

এখন কেউ যদি বলে যে, প্রতি বছর সরকারের পক্ষ থেকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ভাইস চ্যান্সেলরদেরকে নিয়ে যদি বছরে একটি বৈঠক করা হয় এবং কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং কত, তার নিয়মিত ফলোআপ করা হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বা অন্য কোন সংস্থা থেকে, তাহলে কি আপনার মনে হয় এই ধরনের একটি ব্যবস্থা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সামগ্রিক পরিস্থিতিকে কিছুটা হলেও উন্নত করবে?

হ্যা। আমার কাছে আইডিয়াটা ভাল মনে হয়। কিন্তু বিষয়টা হল, এই ব্যবস্থাটা কতটুকু বাস্তবায়িত করা যাবে তা নিয়ে আমার মনে সন্দেহ আছে। এটা এই কারণে যে, র‍্যাংকিং বাড়ানোর জন্য একটি বড় নিয়ামক হল গবেষণা। যেমন আমি নিজের কথাই বলি, আমার কিন্তু গবেষণার মান খুবই খারাপ এবং আমি যদি কোন আন্তর্জাতিক নাম করা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতাম, তাহলে কিন্তু এতোদিনে আমার চাকরি চলে যেত। এটা আমার একটি স্বীকারোক্তি। এখন এই গবেষণার মান বাড়ানোর জন্য যে অবকাঠামো বা একটি সিস্টেমের দরকার, এই ধরনের দায়বদ্ধতাটা বা চাপটা

কিন্তু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপর আসতে হবে রাজনৈতিক নের্তৃত্বের কাছ থেকে এবং এটা হতে হবে খুব জোরালো একটি চাপ।

আমার মনে হয় না এটা একটি মিটিং করে শুধু এটা বলে দেয়া যে তোমার তো র‍্যাংকিং খারাপ, এটা তো বাড়াতে হবে। এইভাবে করলে কোন কাজ হবে না। এভাবে হলে শুধু মিটিংই হবে, লোকজন চা-নাস্তা খেয়ে চলে আসবে। এতে কোন পরিবর্তন আসবে না। বিষয়টা পুরো নির্ভর করে আমাদের দেশের রাজনৈতিক নের্তৃত্ব একে কতোটা গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছে – এটাই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আপনি যদি কখনো সুযোগ পান, আপনাকে যদি কখনো সুযোগ দেয়া হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিয়ে এর সমস্যার সমাধান করতে, তাহলে আপনি প্রথম কোন কাজগুলি করবেন?

আমি যেটা বার বার বলছি, আমি প্রথমেই এটা নিশ্চিত করব বিশ্ববিদ্যালয়ে যেন একটি জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে যেখানে ভাল কাজের জন্য প্রণোদনা থাকবে। সেটা প্রথমেই করতে হবে শিক্ষকতার কাজটিকে নিয়ে। প্রমোশন, সুযোগ-সুবিধা যা কিছু হবে, তার সবই নির্ভর করবে শিক্ষকদের কাজের উপরে। শিক্ষকদের শিক্ষাদান এবং তার মান, স্টুডেন্টেদের সাথে শিক্ষকদের সম্পর্ক, বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে তার কি কি ভূমিকা আছে, তার সবই খুব নিবিড়ভাবে মনিটর করা হবে, তার সবকিছু যাচাই করে শিক্ষকদের সকল সুবিধা দেয়া হবে। এছাড়া আর কোন বিবেচনাতেই তার প্রমোশন বা সুযোগ সুবিধা বাড়ানো হবে না।

সেই সাথে জোর দিতে হবে গবেষণাতে। গবেষণাতে প্রথমেই যেটা দেখতে হবে সেটা হল গবেষণার মান কেমন, তার জন্য একটি মানদন্ড ঠিক করতে হবে। জার্নালগুলিকে তাদের মান অনুযায়ী ভাগ করতে হবে, যেমন প্রথম সারির জার্নাল, দ্বিতীয় সারির জার্নাল, তৃতীয় সারির জার্নাল ইত্যাদি। এই জার্নালগুলিতে পাবলিশ করলে শিক্ষকরা ভিন্ন ভিন্ন পয়েন্ট পাবেন এবং সেই পয়েন্টগুলির উপর ভিত্তি করে শিক্ষকদের প্রমোশন এবং সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। এই রকম একটি পুরস্কার-তিরস্কার নির্ভর সিস্টেম তৈরি না করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি উন্নত হবে না।

আচ্ছা, কিছু কিছু বিষয় তো ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক লেভেলেই করে ফেলা যায়, যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে গেলে দেখা যায় এটা একটি মান্ধাতার আমলের ওয়েবসাইট। বিশ্বের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওয়েবসাইটগুলোর সাথে এই ওয়েবসাইটের তুলনা করলে আমাদের কাছে মনে হবে এটা কোন ওয়েবসাইটই না। আরেকটা বিষয় আমরা লক্ষ্য করেছি খুবই দুঃখজনক ব্যাপার হল, প্রতিটি ডিপার্টমেন্টের যে ফ্যাকাল্টি লিস্ট আছে, সেখানে শিক্ষকদের পেজে গেলে তাদের গবেষণা বা অতীত সাফল্য সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এগুলো তো শিক্ষকরা নিজ থেকেই আপলোড করতে পারতেন। কিন্তু এই ধরনের কোন তথ্য আপনি পাবেন না। আমি আপনার পেজেও গিয়েছি। সেখানেও কিন্তু কোন তথ্য নেই। কিন্তু এগুলো তো শিক্ষকরাই করে ফেলতে পারেন। এর

জন্য তো প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন চাপ দেয়ার দরকার নেই। এগুলো কেন শিক্ষকরা নিজ থেকেই করেন না?

হ্যা। এটা ঠিক। এর কারণ হল সত্যি বলতে কি, আমাদের বেশির ভাগেরই আসলে ভাল কোন গবেষণা নেই যা বলার মত। এই কারণে অধিকাংশ শিক্ষকদেরই এই পেজগুলি আপডেট করার আগ্রহ নেই। এটা অবশ্যই আমাদের দোষ। আমাদেরকে আপনারা বলতে পারেন, আপনারা তো পিএইচডি করেছেন। রিসার্চ করেছেন। আপনারা নিজেরাই কেন এই বিষয়ে তথ্য দেন না।

এখন বিষয়টা হল এমন যে আপনি হার্ভার্ড, স্ট্যানফোর্ড এবং এমআইটি থেকে দশজন শিক্ষক এনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বসিয়ে দেন। আমি দেখতে চাই যে এদের কয়জন রিসার্চ করে, আগামী দশ বছরে তারা কয়টা পাবলিকেশন করে (হাসি)।

কারণ বিষয়টা হল রিসার্চ বলুন, আর অন্য যে কোন কাজ বলুন, তা ভালভাবে করার জন্য কোন কিছু হারানোর ভয় থাকতে হবে। সেই ভয়টা না থাকলে কোন কাজই ভালভাবে হয় না।

আপনি আপনার আর্টিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলেছেন। আপনার আর্টিকেলটি প্রকাশিত হওয়ার পর প্রথম আলোতে একটি বড় নিউজ এসেছে যে বর্তমান উপাচার্যের সময়কালে কোন যোগ্যতা না থাকা সত্বেও অসংখ্য শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পেয়েছেন। একজন বাইরের লোক হিসাবে আমি এতে স্বাভাবিকভাবেই আশা করেছিলাম, এই সংবাদটি প্রকাশ হওয়ার পর অসংখ্য শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উপাচার্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করবেন, তারা ফেসবুকে লিখবেন, তারা অন্যান্য মাধ্যমে লেখালেখি করবেন। কিন্তু আমরা তো সেই রকম কোন ক্ষোভের বিস্ফোরণ লক্ষ্য করিনি। এর কারণ কি বলে আপনার মনে হয়?

এই বিষয়টা নিয়ে আমি এতো বেশি ক্ষুদ্ধ এবং এতো বেশি অবাক যে, আমি এটা নিয়ে একটা লেখাও লিখেছিলাম কিন্তু লেখাটা এখনো শেষ করতে পারিনি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে একই সময়ে আরেকটি ঘটনা ঘটেছে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে, যদিও ঘটনাটা ছোটখাটো। ঘটনাটা হল সেখানকার রেজিস্ট্রার একজন পুরুষ শিক্ষককে মারধর করার কারণে সেই ডিপার্টমেন্টের ছাএ-ছাত্রীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং আন্দোলন করে। যার ফলে ঐ রেজিস্ট্রারকে দীর্ঘমেয়াদী ছুটিতে পাঠানো হয়। একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কত হবে, দশ-বারো হাজারের বেশি হবে না। সেই আন্দোলনে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্টুডেন্ট যোগ দেয়নি। শুধু ল ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টরাই কিন্তু আন্দোলন করেছে।

সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট সংখ্যা প্রায় ৩০-৩৫ হাজার। অথচ এই বিশাল স্টুডেন্টদের দুঃখজনকভাবে কিন্তু কোন ভয়েস নেই। সাধারণ শিক্ষক যারা আছে, তাদেরও কোন ভয়েস নেই। কিন্তু কেন ভয়েস নেই, সেটা আসলে আমি জানি না।

আপনাদের অধ্যাদেশ অনুযায়ী তো শিক্ষকরা স্বাধীন, তাই না? তারা তো যে কোন মতামত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করতে পারেন।

হ্যা। তারা অবশ্যই স্বাধীন। কিন্তু এখানে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কিছু হয় না। আমি একটা কিছু বললে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তারা আমার প্রমোশন আটকে দিতে পারে। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আটকে দিতে পারে। আমার ছুটি আটকে দিতে পারে। আমার উচ্চশিক্ষার জন্য বাইরে যাওয়া বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে বাইরে যাওয়া আটকে দিতে পারে। বাড়ি পাওয়া আটকে দিতে পারে। এই বিষয়গুলো যেহেতু নিয়মতান্ত্রিকভাবে ঘটে না, যেহেতু এগুলো ব্যক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেহেতু মানুষ কিন্তু কথা বলতে ভয় পায়। শিক্ষকরা ভয় পায়। ছাত্র-ছাত্রীরা ভয় পায় যে আজকে আমি যদি প্রতিবাদ করি, তাহলে আমার শিক্ষকরা আমার পরীক্ষার খাতায় নম্বর কম দিতে পারেন।

এর সবই ঘটছে কারণ এখানে অন্যায়-অনিয়ম করে পার পেয়ে যাওয়া যাচ্ছে এবং এটাকেই হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে মানুষকে দমিয়ে রাখা হচ্ছে। অন্যায়ের প্রতিবাদ যুগে যুগে হয়েছে। কিন্তু বিষয়টা হল প্রতিবাদ করাটা যদি এতো সহজ হত, তাহলে সবাই তো সব সময় প্রতিবাদ করত। কিন্তু প্রতিবাদ করাটা কিন্তু কঠিন কাজ। আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তো আরো আগে পাকিস্তানি শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। তখন পরিস্থিতি আরো ভয়ঙ্কর ছিল। কিন্তু এখন কেন প্রতিবাদ করছে না, এটা অনেকে অনেক রকম ব্যাখ্যা দেয়। আমি জানি না এটা কেন হচ্ছে। হয়তো সমাজবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে এর কারণ নির্ণয় করতে পারবেন। কিন্তু এই প্রতিবাদ না করার বিষয়টা আসলে খুবই শকিং এবং খুবই দুঃখজনক ঘটনা যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা, শিক্ষার্থীরা পুরোপুরি নিরব।

আপনি যেটা বলেছেন, ঠিক তাই, তাদের তো ক্ষোভে ফেটে পড়ার কথা। কিন্তু তারা নির্বাক-নিশ্চুপ। এটাই আসলে বলে দিচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি কি, এবং আগামীতে এটি কোথায় যাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভবিষ্যতে কোথায় যাবে, এটা নিয়ে আমি যেটা মনে করি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতিকে এখনই যদি পরিবর্তন করার চেষ্টা না করা হয়, আগামী দশ-পনের বছর পর এটি এমন এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবে, এই রকম আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকাতেই আছে আমি নাম বলছি না, যেখানে শিক্ষার্থীরা আর কোন কিছুতে সুযোগ না পেলে তখন ভর্তি হয়। দুঃখজনকভাবে আমার কাছে মনে হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেদিকেই যাচ্ছে। এটা আমি খুব দুঃখ নিয়েই বলছি।

আপনার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে যে শাস্তি দেয়া হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে আপনার ডিপার্টমেন্টের ৩১ জন শিক্ষকের আবেদনের প্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ৩১ জন তো একটি বিশাল সংখ্যা। ডিপার্টমেন্টের এতোজন শিক্ষক আপনার বিরুদ্ধে চলে গেলেন কেন?

এটার কারণ হল অনিয়মের বিরুদ্ধে কথা বলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউই কিন্তু পছন্দ করে না। এমনকি যে নিয়ম মেনে চলে, সেও কিন্তু পছন্দ করে না। কারণ এই যে জবাবদিহিতার একটি ব্যবস্থা,

এটা যে সবার জন্য খুব ভাল তা কিন্তু নয়। জাবাবদিহিতা ছাড়া থেকে কিন্তু মানুষ আনন্দ পায়, এনজয় করে। সে মনে করে আমার তো কারো কাছে কোন জবাবদিহিতা নেই, কি মজা। কখন আসছি, যাচ্ছি, ক্লাসে পড়াচ্ছি কিনা, সেটাও কেউ খেয়াল করছে না।

এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলাটা আসলে কেউ পছন্দ করে না। আমি দেখেছি যখনই এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা হয়, তখনই দেখা যায় যে এর পিছনে কেউ কোন সমর্থন দেয় না। এবসলিউটলি নো সাপোর্ট। তো এই বিষয়গুলো নিয়ে যখন আমি চিঠি লিখলাম, ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যানের কাছে আমি সাতটি চিঠি দিয়েছি। কিন্তু এরপরে এই বিষয়টা নিয়ে আমি যার সাথেই কথা বলেছি, তারা বলেছে যে এগুলো বলার কি দরকার। এতো ঝামেলা কেন? এভাবেই তো বিশ্ববিদ্যালয় চলছে বছরের পর বছর। তুমি ঠিকমত পড়ালেই তো হয়। এইসব নিয়ে কথা বলার তো দরকার নেই।

অনিয়ম, একাডেমিক ডিসিপ্লিন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কথা বললে আসলে কারো সমর্থন পাওয়া যায় না। বরং আমি দেখেছি যে সবাই একতাবদ্ধ হয়ে পিছনে লেগে যায় কারণ তারা এটিকে তখন হুমকি হিসাবে মনে করে। এখানে কিন্তু তারাও আছেন যারা নিয়ম মেনে চলেন। কারণ তারা মনে করেন যে আমি তো নিয়ম মানছি, কিন্তু হঠাৎ করে যদি কখনো নিয়ম ভঙ্গ করি, তখন তো আমি আবার বিপদে পড়ব। তখন যদি আবার আমার জবাবদিহি করতে হয়, তখন তো তা সমস্যার সৃষ্টি করবে। তাই কি দরকার। যেরকম আছে সেই রকমই তো ভাল।

আপনি কি নিজে সবসময় নিয়মিত ক্লাস নেন?

হ্যা। একজন মানুষ হিসাবে, একজন পেশাজীবী হিসাবে আমি বলতে পারি যে, আমার অন্যান্য অনেক সমস্যা থাকতে পারে, কিন্তু আমার কাজের বেলায় বিশেষ করে আমার শিক্ষকতার ব্যাপারে আমি গর্বের সাথে আমি বলতে পারি, আমার যে নূন্যতম দায়িত্ব, সেটা তো আমি পালন করিই, সেই সাথে এর বাইরেও আমি আরো অনেক কিছু করার চেষ্টা করি।

যারা আমার ক্লাস করেছে, তাদের কারো সাথে আপনি যদি কথা বলেন, তাহলে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, তারা সবাই বলবে আমি আমার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছি এবং তারা আমার ক্লাস নিয়ে উপকৃত হয়েছে। ক্লাস নেয়া ছাড়াও আমি ডিপার্টমেন্টে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের এক্সট্রা-কারিকুলার কার্যক্রম করতে উৎসাহ দেই।

আমি একটি ক্যারিয়ার সেন্টার করার ব্যাপারে কাজ করেছি। অন্যান্য বিভিন্ন কালচারাল প্রোগ্রামের বেলাতেও দেখা গেছে আমিই সব সময় এগিয়ে এসেছি। আগেও আসতাম, এখনো আসি। এর কারণ আমার কাছে মনে হয় শিক্ষকতা কোন রোবোটিক কিছু নয় যে আমি শুধু গেলাম, এবং পড়িয়ে চলে আসলাম। আমার দায়িত্ব শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে মোটিভেট করা, তাদেরকে পথ দেখানো। এই

বিষয়গুলো আমি অনেক আগ্রহের সাথে করছি, করতাম। কিন্তু আমার সেই আগ্রহ কিন্তু দিন দিন কমে আসছে। এখন ভবিষ্যতে কি হবে, তা আমি জানি না।

আপনি যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে লেখালেখি করেছেন, প্রতিবাদ করেছেন, সেহেতু আমি কি বলব যে আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী?

এই মুহূর্তে যদি আপনি আমাকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করেন, তাহলে আমি বলব আমি আশাবাদী নই।

আমরা যদি কল্পনার একটি চিএ আকি যেখানে সারা বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি র‍্যাংকিং করা হয়েছে এবং তার সেরা দশটির মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আছে। আপনার কি মনে হয় এটা একটি কল্পনাবিলাস, নাকি এটা বাস্তবেও হতে পারে?

এটা তখনই সম্ভব হবে যখন দেখা যাবে যে বাংলাদেশের সামগ্রিক অবস্থান ওইরকম একটি র‍্যাংকিংয়ের জায়গায় এসেছে। সুশাসনের কোন সূচকে বাংলাদেশ যদি কখনো সেরা দশে আসে, তখনই কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা দশে আসার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। তার আগে তো তা হবে না।

কিন্তু এটা তো অনেকটা Chicken and Egg Problem এর মত, ডিম আগে, নাকি মুরগি আগে – এই সমস্যাটির মত হয়ে গেল। আগে কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশাসন আসবে, নাকি সারা দেশের সুশাসন আসার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশাসন আসবে (হাসি)? এই সুশাসনটা কারা আনবে? এটা তো নের্তৃস্থানীয় লোকরাই আনবে, এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো নের্তৃত্বের পর্যায়েই আছে। তারা যদি সুশাসন না আনে, তাহলে আনবে কে? আর তারা যদি না আনে, তাহলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে না। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিংও উন্নত হবে না (হাসি)।

হ্যা। সেটা বলতে পারেন। এক্সেক্টলি। আপনার কথাটা বুঝতে পারছি (হাসি)। এখন বিষয়টা হল যে সুশাসনের ঘাটতি তো একটি জটিল সমস্যা। আমরা সবসময় বলি যে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোতে যারা নের্তৃস্থানীয় আছেন তারা ভাল হয়ে গেলে, দেশ থেকে দুর্নীতি দূর হয়ে যাবে। কিন্তু তারা আবার ভাল হবে কোথা থেকে। তাদেরকে তো আমরাই নির্বাচিত করেছি। আমাদের থেকেই তো তারা আসছেন। তাই জনগোষ্ঠী যদি ভাল না হয়, তাহলে ভাল নেতা তৈরি হবে কোথা থেকে।

এই সমস্যাগুলোতো ঘুরে ঘুরে আসছে। এগুলো তো সাইক্লিক্যাল প্রবলেম। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বলা যায়, আমরা যেভাবে এখানে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি, বিশেষ করে সবচেয়ে শীর্ষ যে পদটা, উপাচার্যের পদ, যিনি কিনা লিডার, যিনি কিনা আমাদেরকে গাইড করবেন, তার সিলেকশন প্রসেসটাই রাজনৈতিকভাবে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। এখন আপনি যেটা বলতে পারেন, আপনারা এতোজন উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক আছেন, আপনারা বিশ্বের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেছেন, আপনারা কেন এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছেন না? এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে আপনারা কেন সিস্টেমটা ঠিক করছেন না? এই প্রশ্নের উত্তর আসলে আমার জানা নেই।

আপনি যে সকল গবেষণা অতীতে করেছেন, তার মধ্যে কি এমন কোন গবেষণা আছে যার কথা আপনি আমাদের পাঠকদের সাথে শেয়ার করতে চান?

আসলে গবেষণার ব্যাপারটি আমি ইতিমধ্যেই স্বীকারও করেছি যে আমার গবেষণাগুলো আসলে সে রকম কোন উন্নতমানের কিছু নয়। গবেষণা আমি যেগুলো করেছি, সেগুলি আমার কাছে কখনো মনে হয়নি যে আমি বিরাট কোন জ্ঞান সৃষ্টি করে ফেলেছি কিংবা গবেষণাতে অনেক অবদান রেখেছি। যেগুলো করেছি সেগুলো আমার কাছে মনে হয়নি খুব একটা উচ্চমানের।

সত্যি কথা বলতে কি আমি এটা লজ্জার সাথে বলছি যে আমি এখন সবার সাথে শেয়ার করার মত এমন কিছু পাচ্ছি না। আরেকটা বিষয় হল আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশে আমার একাডেমিক ক্যারিয়ার ভবিষ্যতে কতটুকু চালিয়ে যেতে পারব, সেটা আমি জানি না। এমনও হতে পারে যে আমি হয়তো আমার ক্যারিয়ার পরিবর্তন করে ফেলেছি। ভবিষ্যতে আমার ক্যারিয়ার কোন দিকে নেয়া যেতে পারে আমি এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছি।

ঠিক আছে। আমি তো এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি। বিদেশেও পড়েছি। আপনিও পড়েছেন। আমি মনে করি বিশ্বের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে যদি আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক অবকাঠামো তুলনা করেন, তাহলে খুব একটা তফাত পাবেন না। বিশ্বমানের মৌলিক অবকাঠামো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে। শিক্ষার্থীদের মান তো আগে অনেক ভাল ছিল। অনেকে এখান থেকে পাশ করে সারা বিশ্বে সুনাম অর্জন করেছেন। আমি জানি না এখনো একই মানের শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাচ্ছে কিনা। আর ভাল শিক্ষার্থী যদি আসে, তাহলে শিক্ষকের মানও ভাল হবে।

আমরা আপনার এই সাক্ষাৎকারটি নিলাম, কারণ আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর থেকে বিভিন্ন অনিয়মের কথাগুলো জানতে চাচ্ছিলাম। এই অনিয়মগুলো দূর করা গেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মান অনেক বাড়বে। এই মান বাড়ানো প্রয়োজন কারণ আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী। আমাদের বিশ্বাস আমাদের এই আলোচনার মাধ্যমে যে বিষয়গুলো বের হয়ে এসেছে, বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এর থেকে উপকৃত হবেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভবিষ্যতে সঠিক পথেই চলবে, উল্টো পথে নয়। আপনি আমাদেরকে অনেক না বলা কথা বলেছেন।

আসলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি হচ্ছে, অনিয়ম হচ্ছে – এই অভিযোগ অনেক পুরনো। আমরা যখন শিক্ষার্থী ছিলাম, তখনো আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতাম, তবে এটা ছিল শিক্ষার্থী পর্যায়ে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সময়ে লেখালেখি করেছে। আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে ছদ্মনামে লিখেছি।

কিন্তু শিক্ষকদের তরফ থেকে খুব সম্ভবত আপনিই প্রথম যিনি এই অচলায়তনটা ভাঙ্গার একটি চেষ্টা করেছেন। আমি আপনার এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই। আপনার প্রতি আমাদের শুভকামনা রইল। আশা করি আপনার প্রচেষ্টা সফল হবে ইন শা আল্লাহ। আপনার এই প্রচেষ্টার কারণে ভবিষ্যতে ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় যদি আরো ভাল অবস্থানে যায়, তাহলে আপনার এই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আমি মনে করি একটি মাইলফলক হিসাবে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে।

ডঃ রুশাদ, এই আশা এবং প্রত্যাশা নিয়েই আমরা আজকের সাক্ষাৎকার শেষ করছি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেয়ার জন্য।

আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডিজাইন এবং সম্পাদনা
মাবরুর মাহমুদ

আইএফডি পরিচিতি

IDEAS FOR DEVELOPMENT (IFD) একটি ভারচুয়্যাল থিঙ্ক ট্যাংক (Virtual Think Tank)। এর মূল ধারণার প্রকাশ ঘটে ২০০৭ সালের জানুয়ারী ১৮ তারিখে একটি ইমেইলের মাধ্যমে। এই থিঙ্ক ট্যাংকটির কোন অফিস নেই। এর ওয়েব এবং ইমেইল এড্রেসই এর ঠিকানা। এই থিঙ্ক ট্যাংকটির উদ্যোক্তা মি. মাবরুর মাহমুদ। তিনি একজন বাংলাদেশি নাগরিক। আইএফডি তারই চিন্তার ফসল।

এই ভারচুয়্যাল থিঙ্ক ট্যাংকটির মূল উদ্দেশ্য ইন্টারনেটের শক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আইডিয়ার আদান প্রদানের মাধ্যমে দেশ, জাতি এবং সর্বোপরী মানবতার সার্বিক উন্নয়ন সাধন করা। এটাই এই থিঙ্ক ট্যাংকটির মিশন স্টেটমেন্ট।

এই মিশন স্টেটমেন্ট প্রতিফলিত হয়েছে এই থিঙ্ক ট্যাংকটির লোগোতেও। এর লোগোতে চার রঙের ব্লক ব্যবহার করা হয়েছে। এই চারটি রঙের মাধ্যমে বিশ্বের চারটি জাতি বা রেসকে (Race) বোঝানো হয়েছে। আইএফডি বিশ্বাস করে বর্তমান বিশ্বে যে অস্থিরতা এবং অশান্তি রয়েছে, তার মূলে রয়েছে জাতিগত অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বৈষম্য। তাই আমরা বিশ্বাস করি এই নানাবিধ বৈষম্য যদি দূর করা যায়, তাহলে বিশ্বে অস্থিরতা অনেক কমে আসবে।

কিন্তু বৈষম্য কমানোর জন্য চাই নতুন নতুন উন্নয়ন আইডিয়া। বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর জাতিগুলি বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে নিত্যনতুন উন্নয়ন আইডিয়া তৈরি করছে এবং তার সফল বাস্তবায়ন করে দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশগুলি সম্পদ কম থাকার কারণে বা সম্পদের যথেচ্ছ অপব্যবহারের কারণে এই প্রতিযোগিতায় দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে। ফলে উন্নত এবং উন্নয়নকামী দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান বাড়ছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে দারিদ্র্য এবং শোষণ।

বিভিন্ন আইডিয়া উদ্ভাবনের মাধ্যমে জাতিগত এই ব্যবধান কমানোর একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই আইএফডির সৃষ্টি। আইএফডি বিশ্বের সকল চিন্তাশীল এবং উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী মানুষদের আইডিয়া আদান প্রদানের প্ল্যাটফর্ম হতে চায়। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে চিন্তাশীল মানুষরা তাদের আইডিয়ার আদান প্রদান করবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

আইএফডির মাধ্যমে আইডিয়া আদান প্রদান করলে একজন উদ্ভাবক বেশ কয়েকটি সুবিধা পাবেন।

প্রথমত, উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য আইডিয়া তৈরি করাই শেষ কাজ নয়, বরং এটি পুরো প্রক্রিয়াটির শুরু মাএ। একজন উদ্ভাবককে শুধু আইডিয়া তৈরি করলেই চলবে না, বরং একটি সমস্যার চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধমে তার নতুন আইডিয়াটি দিয়ে সমস্যাটি কিভাবে সমাধান করা যাবে, তা উপস্থাপন করতে হবে একটি মডেলের আকারে। সেই মডেল আবার বাস্তবায়নযোগ্যও হতে হবে। এর অন্যথা হলে সেই আইডিয়াটির আসলে কোন মূল্য নেই।

আমাদের চারপাশে নতুন আইডিয়া দেয়ার লোকের আসলে কোন অভাব নেই। তবে একটি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত এবং সর্বোপরী বাস্তবায়নযোগ্য আইডিয়া প্রণেতার সঙ্কট সর্বএই।

এই সঙ্কট সমাধানকল্পে আইএফডি একজন উদ্ভাবককে তার আইডিয়া সুন্দরভাবে উপস্থাপনের পথ দেখিয়ে দেবে। এক্ষেত্রে আইএফডি সম্ভব সবরকম গাইডেন্স প্রদান করবে এবং একটি সম্ভাবনাময় অথচ অপরিপক্ক আইডিয়াকে পরিপূর্ণ করতে সকল ধরনের সহায়তা প্রদান করবে।

দ্বিতীয়ত, আইএফডিতে আইডিয়া পাঠানোর জন্য কোন যোগ্যতার প্রয়োজন নেই। যে কোন ব্যক্তি যে কোন স্থান থেকে যে কোন মাধ্যমে আইএফডিতে আইডিয়া পাঠাতে পারেন।

তৃতীয়ত, বর্তমানে আইএফডি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক আইডিয়া আদান প্রদানের প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করলেও ভবিষ্যতে অন্যান্য অনেক বিষয়ও ধীরে ধীরে এর কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

চতুর্থত, আইএফডির মাধ্যমে কোন আইডিয়া প্রচার করা হলে সেই আইডিয়াটি যে একটি সুষ্ঠু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, সে ব্যাপারে সকলেই নিশ্চিত থাকবেন। ফলে আইডিয়াটির গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। এখানে বলে রাখা দরকার, আইএফডি যে কোন আইডিয়া পেলেই তা প্রচার করবে না। বরং একটি আইডিয়ার মাধ্যমে সমাজ কতটুকু উপকৃত হতে পারে, সেটাই হবে আইডিয়া নির্বাচন করার মূল ভিত্তি।

এবং পঞ্চমত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হল, আইএফডিতে আইডিয়া পাঠাতে হলে উদ্ভাবককে কোন খরচ করতে হবে না, শুধুমাত্র পোস্ট কিংবা ইমেইলের খরচ ছাড়া। এই আইডিয়া যদি প্রচারযোগ্য হয়, তাহলেও উদ্ভাবককে কোন প্রকার ফি বা চার্জ দিতে হবে না।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, কোন এক চিন্তাশীল ব্যক্তি কোন সম্ভাবনাময় আইডিয়া দিলে তা চুরি হয়ে যেতে পারে। ফলে একজন আইডিয়ার উদ্ভাবক বঞ্চিত হবেন তার যথাযথ স্বীকৃতি থেকে।

এক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আইএফডির কাছে কেউ কোন আইডিয়া পাঠালে তা উদ্ভাবকের অনুমতি ছাড়া অন্য কোথাও অন্য কোন নামে ব্যবহার করা হবে না। আমাদের মতে, শুধুমাত্র একজন আইডিয়ার কারিগরের পক্ষেই সম্ভব অন্য আরেকজন আইডিয়ার কারিগরকে যথার্থ মূল্যায়ন করা।

আইএফডি বিশ্বাস করে একটি আইডিয়ার প্রকৃত মূল্যায়ন হয় তখনই যখন তা আংশিক বা পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং তা মানুষের কাজে লাগে। এ দিক থেকে আইএফডির একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কারণ অনেক উন্নয়নমূলক আইডিয়ার সফল বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার সহ অন্যান্য অনেক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। তাই আইএফডি এমন কোন নিশ্চয়তা দিতে পারবে না যে আইএফডির মাধ্যমে কোন সম্ভাবনাময় আইডিয়া প্রচার হলেই তার সফল বাস্তবায়ন হবে। আইএফডি শুধু আইডিয়া তৈরি এবং প্রচারের প্ল্যাটফর্ম হিসাবেই কাজ করবে। এর বাস্তবায়নের দায়িত্ব আইএফডির নয়।

তবে আইএফডির কার্যক্রম শুধুমাত্র আইডিয়া তৈরি এবং তার প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। আইডিয়া তৈরি এবং তার সফল বাস্তবায়নের জন্য যেমন প্রয়োজন চিন্তাশীল মানুষ, তেমনি প্রয়োজন সঠিক রাজনৈতিক নের্তৃত্ব, বলিষ্ঠ সরকার কাঠামো, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সর্বোপরী একটি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশ। উপযুক্ত পরিবেশ না থাকলে চিন্তাশীল মানুষের যেমন জন্ম হবে না, তেমনি অস্থিতিশীল সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশে চিন্তাশীল মানুষদের উন্নয়ন আইডিয়ার যথার্থ মূল্যায়ন এবং বাস্তবায়নও হবে না।

তাই উন্নয়ন আইডিয়া প্রচারের পাশাপাশি আইএফডি এমন একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করবে যার মাধ্যমে যেন সমাজে সৃষ্টিশীল মানুষদের সংখ্যা বাড়ে, তাদের যথার্থ মূল্যায়ন হয় এবং তাদের আইডিয়ার সফল বাস্তবায়ন হয়। এই লক্ষ্যে আইএফডি বিভিন্ন ইস্যুতে তার মতামত ব্যক্ত করবে এবং বিভিন্ন রচনা প্রচার করবে।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, আপনি যদি আপনার কোন আইডিয়া নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হোন, এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন এই আইডিয়াটি বাস্তবায়িত হলে সমাজের কিছু কল্যাণ সাধিত হবে, তাহলে আইডিয়াটি আমাদেরকে লিখে পাঠান। এর জন্য প্রাথমিকভাবে ইমেইল করুন আমাদের ঠিকানায়। আমাদের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট।

আমাদের বিশ্বাস এই ধরণের আইডিয়া আদান প্রদানের মাধ্যমে সর্বএ নতুন নতুন চিন্তাশীল মানুষের বিকাশ ঘটবে। তাদের চিন্তালব্ধ আইডিয়ার সফল বাস্তবায়ন হলে লাভবান হবেন সকলেই। তাই এর জন্য প্রয়োজন সকলের সহযোগিতা। আইএফডির মাধ্যমে উন্নয়নমূলক আইডিয়া প্রচারের জন্য যে কোন প্রকার সহযোগিতাকে তাই আমরা স্বাগত জানাই।

©IDEAS FOR DEVELOPMENT (IFD)
www.ideasfd.org
ideasfd@gmail.com

[Keyword for Websearch: Dr Rushad Faridi, IFD Exclusive Interview 3, Dhaka University, Governance]